ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা

মোস্তাফা জব্বার

সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশের দুর্নীতির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রটি হলো ভূমি ব্যবস্থা। প্রায় প্রতিটি মানুষই জানে এর সাথে শুধু দুর্নীতিই নয়, দেশের মামলা মোকদ্দমার সিংহভাগও জড়িত। সম্ভবত এটিও সত্য, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটিও হতে যাচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত। আমরা জানি, জনসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশের ভূমির পরিমাণ খুবই কম। আমরা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এতবেশি লোক বাস করি, এক সময়ে আমাদের সব মানুষের জন্য শুধু বাসস্থান পাওয়াই দুরূহ হয়ে পড়বে। এখনই মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইল একটি ভূখণ্ডে ১৬ কোটি মানুষের বসবাস সত্যিই অভাবনীয়। তদুপরি প্রতিদিন বাড়তি জনসংখ্যার চাপ নিতে হচ্ছে এ দেশটিকে। দেশের কিছু বিশেষ এলাকা যেমন উপকূল, দ্বীপ, জলাভূমি-নিম্নাঞ্চল, বিল অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল বা হাওর অঞ্চল; যেখানে মানুষের বসবাস প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি, সেসব অঞ্চল ছাড়া প্রয়োজনীয় বাসস্থান এবং চাষের জমি বলতে গেলে নেই। নগরায়ণ বা শিল্পায়ন জমির ওপর আরও বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ৮ জুলাই ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন ৪৪৪ একর কৃষিজমি কমে যাচ্ছে। এ হিসাবে প্রতিঘণ্টায় কমছে ১৮ একর জমি। এভাবে চললে আগামী ৫০ বছরে এক ইঞ্চি জমিও থাকবে না চাষাবাদ করার জন্য। পত্রিকার খবরে আরও বলা হয়, ১৯৭৪ সালে আবাদি জমি ছিল মোট জমির শতকরা ৫৯ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে তা কমে ৫৩ শতাংশে নেমে আসে। এখনকার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর ১ লাখ ৬০ হাজার একর আবাদি জমি কমছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের কারও মাঝেই এ বিষয়ে কোনো উদ্বেগ বা শঙ্কা লক্ষ করছি না। কেউ ভাবছেন না, ফসলি জমি না থাকলে আমাদের পরিণতি কী হবে? বড় কষ্ট নিয়ে বলতে হচ্ছে, ফসলের জমি না থাকলে কোটি কোটি মানুষের খিদায় অন্ন আসবে কোন উৎস্য থেকে– এ কথাটি অনুগ্রহ করে কেউ না কেউ ভাবুন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পিও ৯৮-এর আওতায় ভূমির সিলিং ১০০ বিঘায় করলেও আইনের নানা ফাঁকফোকর দিয়ে জোতদারের জমি জোতদারের কাছেই থেকে গেছে। তারা নানা নামে-বেনামে, এক পরিবারকে নানা পরিবারে বিভাজিত করে এসব জমি কাগজে-কলমে হস্তান্তর করে নিজের পরিবারের মাঝেই রেখে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ১০০ বিঘার সিলিংটাই সঠিক ছিল না। সেটি ১০ একর বা ১০০০ শতাংশ হলে কিছু ফলাফল পাওয়া যেত। ফলে বঙ্গবন্ধুর ভূমি সংস্কারের ঘোষণার পরও দেশের মোট চাষযোগ্য ভূমির বৃহদাংশ স্বল্পসংখ্যক লোকের (পরিবার বললে ভালো হয়) হাতে পুঞ্জিভূত রয়েছে। এ জনগোষ্ঠী আবার নিজেরা জমির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এরা শহুরে বা অন্য পেশায় জীবনধারণ করে। কৃষক বা ভূমিহীন বা বর্গাচাষীরা এদের জমি চাষ করে।

১০০ বিঘার সীমাকে বেশি মনে করে ১৯৮৪ সালে কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা ৬০ বিঘা করা হয়। কিন্তু তাতেও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। কারণ, জমিগুলো যখন পরিবারের বিভিন্ন জনের হাতে ভাগ হয়ে যায়, তখন ৬০ বিঘার বাড়তি জমি আর অবশিষ্ট থাকেনি।

বর্তমানে দেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। বাসস্থান নেই কোটি কোটি মানুষের। শহরের বস্তি এলাকার অধিবাসীরা প্রকৃতার্থেই ছিন্নমূল। ভূমি ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য সরকারের খাসজমি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে চরম দুর্নীতি। প্রকৃত ভূমিহীনরা খাস জমি পায় না। জোতদারেরাই নামে-বেনামে খাস জমি দখল করে থাকে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীরাও দুর্নীতির মহাসমুদ্রে বাস করে। জমি রেজিস্ট্রি থেকে জরিপ– সর্বত্রই ঘুষ ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু এরচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় ভূমি নিয়ে বিরোধ। দীর্ঘদিন ধরে কায়িকভাবে ভূমির রেকর্ডপত্র রক্ষা, রেজিস্ট্রেশন, নকশা প্রস্তুত ও জালিয়াতি ইত্যাদি করার ফলে ভূমি নিয়ে বিরোধ দিনে দিনে বাড়ছে।

সন্ত্রাস, খুন-খারাবি, ঝগড়া-বিবাদের বড় উৎসই হলো ভূমি সংক্রান্ত। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমাও ভূমি সংক্রান্ত। জালিয়াতি, প্রতারণা, জবরদখল ইত্যাদির সাথেও ভূমি ব্যবস্থাপনা জড়িত।

সম্প্রতি ভূমি ব্যবস্থাপনার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হলেও অন্য কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সাধারণ মানুষ ভূমি নিয়ে এত বেশি সমস্যাকবলিত হয়, সেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও তার জানা নেই। ভূমি সংক্রান্ত মামলা বা বিরোধ বছরের পর বছর সম্প্রসারিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানের মতে, দেশে ভূমি সংক্রান্ত একটি মামলার সাধারণ নিষ্পত্তি হতে ৮ বছর সময় লাগে। এসব মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে ১৪ বছর (সূত্র দৈনিক আজকের কাগজ, ২৭ এপ্রিল ২০০৭)। কোনো কোনো সময় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভূমি সংক্রান্ত মামলা চলে। এতে বোঝা যায়, ভূমি এ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কী ভয়ঙ্কর সঙ্কট তৈরি করে চলেছে। ৬ জুন ২০০৯ সালে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ভূমি ব্যবস্থাকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন। ডিজিটাল পদ্ধতি ছাড়া এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় নেই। কারণ, ভূমির কাজকর্ম একটি বা দুটি অফিসে সম্পন্ন হয় না। এমনকি একটি মন্ত্রণালয়েও ভূমির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ নয়।

পাওয়া তথ্যানুসারে ভূমির সাথে যুক্ত রয়েছে সরকারের অনেক শাখা-প্রশাখা। এরা ভূমি সংক্রান্ত একেক কাজ একেকজন করে থাকে। এদের অবস্থা দ্বীপের মতো। কারও সাথে কারও তেমন কোনো সংযোগ নেই। সরকারের যে অংশগুলো ভূমি নিয়ে কাজ করে সেগুলো হলো– ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতর, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিস, জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, সাব রেজিস্ট্রার অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস।

তবে এসব অফিস প্রধানত তিন ধরনের কাজ করে থাকে। একটি হলো ভূমির দলিল নিবন্ধন করা। এটি করে থাকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, যা আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। আরেকটি হচ্ছে ভূমির রেকর্ড। এটির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় রয়েছে। এ দুটি কাজের বাইরে ভূমির মালিকানা বিষয়টি দেখে থাকে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন আবার ভূমি অধিগ্রহণের কাজও করে থাকে।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে সম্প্রতি কিছুটা নড়াচড়া শুরু হয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০১০ বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমিমন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভূমি প্রতিমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ প্রশাসন ও বেসরকারি উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাচক্রে এ লেখক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সে সুবাদে ভূমি সংক্রান্ত সরকারের পরিকল্পনা বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থাটি ওই লেখকের পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়। সেই সভার কার্যপত্রে বলা হয়, বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতর দেশের সব এলাকায় ডিজিটাল নকশা ও ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুত, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম, ডিজিটাল নকশা ও খতিয়ান প্রণয়ন ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতর কর্তৃক ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে 'সাভার ডিজিটাল জরিপ ২০০৯'-এর কাজ শুরু করা হয়েছে। নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৪টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম ভূমিমন্ত্রীর মাধ্যমে উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ভিশনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরে সম্প্রতি ১৯১টি মৌজায় সম্পাদিত জরিপ অনুযায়ী ৪ লাখ ৪১ হাজার ৫০৬টি খতিয়ান ও ৪ হাজার ৮৯টি ▸

মৌজাম্যাপ শিট ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তৈরি রেকর্ড ওয়েবসাইটে অচিরেই প্রকাশ করা হবে। 'কমপিউটারাইজেশন অব ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জেলার পাঁচটি উপজেলাকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে নেয়া হয়েছে। এ কাজে সফলতা পাওয়া গেলে সারাদেশে ৬৪ জেলাকে এর আওতায় আনা সম্ভব হবে।

সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ানের ওপর ভিত্তি করে পার্বত্য তিন জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের সব উপজেলা ও সিটি সার্কেলের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা চালুর লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৫২ দশমিক ৮৪ কোটি টাকা। প্রকল্পটিতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা কমিশনে অচিরেই তা পাঠানো হবে। এ ছাড়া সেটেলমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন করে প্রমাণ অর্জনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, আন্তর্জাতিক সীমার স্ট্রিপ ম্যাপ ডিজিটাইজেশন ও আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের আধুনিকায়ন, সারাদেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি, ডিজিটাল ভূমি তথ্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ 'ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তথা এডিবির সহায়তায় ১ কোটি ২৯ লাখ ৭০ হাজার মিলিয়ন ডলার ঋণের আশ্বাস পাওয়া গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলার ৪৫টি উপজেলার সব মৌজার সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

কার্যপত্রটি পাঠ করার পর বুকটা ফুলে যাওয়ার মতো দশা হয়েছে। সভায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মহাপরিচালক ও অন্যরা যেভাবে এ ডিজিটাল রূপান্তরটি দুয়েক বছরের মাঝেই সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন, তাতে সত্যি সত্যি খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু যদি কোনোভাবে অতীতের দিকে নজর যায় তবে তার মাঝে হতাশা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। অতীতেও এমন অনেক পাইলট প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মৃত্যু হয়েছে সেখানেই। খতিয়ান ও মৌজা মুদ্রণ কাজটির সূচনা হয়েছে দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে, কিন্তু সফলতা একেবারেই নেই। তবুও যদি এডিবির টাকায় এত বড় কাজটি শুরু হতে পারে, তবে আমাদের আশায় বুক বাঁধার উপায় থাকবে।

সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ভূমি রেকর্ড ও ভূমি জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আসলাম আলমের উপস্থাপনা। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। তার আলোচনায় অনেক বাস্তব প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে।

এখানে বিষয়গুলোকে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। প্রথমে আইনের কথা বলা যায়। আমাদের দেশের উত্তরাধিকারী আইন ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন কার্যত ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলের। ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় লক্ষ্য হতে হবে ভূমি সংস্কার এবং এর ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার। প্রথমত এজন্য ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলোকে আমূল বদলাতে হবে। এর মাঝে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মালিকানার বিষয়টি মীমাংসা করতে হবে। কেউ একটি জমি কিনল এবং সেই কেনা জমি অন্য একজন দখল করে রাখলে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হবে। এর মীমাংসা হতে হবে। জমির নিবন্ধন মানেই মালিকানা নাকি দখল মানেই মালিকানা, সেটি যেমন জরুরি, তেমনি কার উত্তরাধিকার কে, কার কাছে বিক্রি করা হলো বা কে ভোগ দখল করল– এসব প্রশ্নের মীমাংসার জন্যও আইনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার। আবার কে খাজনা দিল, কার নামে দলিল, উত্তরাধিকার সূত্রে কে জমিটি বিক্রি করতে পারে বা কে পেতে পারে ইত্যাদি ছাড়াও আছে জমির অতীত অনুসন্ধান ও মালিকানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা। এক নাম্বার খতিয়ান বা খাস জমি বিষয়ক জটিলতা ও অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতারও অবসান হওয়া চাই। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বছরের পর বছর মামলা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। প্রয়োজনে আলাদা আদালত গঠন করে ভূমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে।

ভূমি ব্যবস্থাকে অ্যানালগ বা কাগজভিত্তিক রেখে আইন বদলালেও এর সুফল জনগণ পাবে না। এজন্য ভূমির তথ্যাদি বিদ্যমান অ্যানালগ কাগুজে পদ্ধতিকে ডিজিটাল করতে হবে। ভূমি সংক্রান্ত সব ধরনের নকশা ডিজিটাল করতে হবে। জমি রেজিস্ট্রি, হস্তান্তর, রেকর্ড, মামলা-মোকদ্দমা, আইনি ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত চিত্রকে ভিত্তি করে ডিজিটাল নকশা তৈরি করে এর সাথে জমির মালিকানা এবং অন্যান্য তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এসব তথ্য সাধারণ মানুষ যাতে খুব সহজেই পেতে পারে, সেজন্য এগুলো ইন্টারনেটে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে একটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার, শুধু ইন্টারনেটে তথ্য রাখলেই দেশের সাধারণ মানুষ সেসব তথ্য নিজেদের কাজে লাগাতে পারবে তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং ইন্টারনেটে তথ্য রাখার পাশাপাশি গ্রামের মানুষের হাতের কাছে ভূমি বিষয়ক ডিজিটাল তথ্য অবশ্যই থাকতে হবে।

ব্যবস্থাটি এমন হবে, মানুষ যেমন করে টেলিফোন বিল বাড়িতে বসে জানতে পারে, একটি স্টার, তারপর তিন-চারটি সংখ্যা এবং হ্যাশ বোতাম চাপে ও পুরো তথ্যটি তার কাছে চলে আসে, তেমনি মানুষ এটিও জানতে পারবে, কোন জমিটি কার মালিকানায় আছে, এর খাজনা কত, কবে এর শেষ খাজনা দেয়া হয়েছে এবং এটি কার দখলে আছে। একই সাথে মানুষ এটিও জানতে পারবে, জমিটি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্ধক দেয়া আছে কি না বা এর মালিকানা নিয়ে কোনো আদালতে কোনো মামলা আছে কি না। মালিকানার বদল বা অন্য কোনো রেকর্ডের পরিবর্তনও সাথে সাথে আপডেট করতে হবে। ফলে ভূমি নিয়ে জালিয়াতি-প্রতারণা করার কোনো সুযোগ থাকবে না। ভূমি রেকর্ডের সাথে ডিজিটাল ভোটার তালিকা এবং ডিজিটাল জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পকে যুক্ত করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এটি জানা যাবে, কোন ব্যক্তির কোথায় জমি আছে এবং কোন সম্পদের মালিক কে। প্রতিটি মানুষেরই একটি সম্পদের বিবরণী থাকতে হবে। দেশের (প্রয়োজনে বিদেশেরও) যেখানেই তার যেসব সম্পদ থাকবে, তার বিবরণ ওই হিসাবে থাকবে। কেউ সেই সম্পদ বিক্রি করলে সেটি তার হিসাব থেকে বাদ যাবে। আবার কেউ কোনো সম্পদ কিনলে তার হিসাবে সেই সম্পদ যোগ হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হিসাব থেকে শুরু করে আয়কর পর্যন্ত সবকিছুই একটি বোতামের নিচে নিয়ে আসা যাবে।

জনকণ্ঠের একটি খবরে বলা হয়েছে, দেশে প্রতিঘণ্টায় কৃষি জমি কমছে ১৮ একর। এভাবে চললে আগামী ৫০ বছরে এক ইঞ্চি জমিও থাকবে না চাষাবাদ করার জন্য। একই পত্রিকার খবরে আরও বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে আবাদি জমি ছিল মোট জমির শতকরা ৫৯ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে তা ৫৩ শতাংশে নেমে আসে। আজকের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর ১ লাখ ৬০ হাজার একর আবাদি জমি কমছে।

কিন্তু এতসব নির্মম সত্য আমাদের চোখের সমানে থাকার পরেও বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন অপরিকল্পিকভাবে পুরো দেশের ভূমি ব্যবহার করা হচ্ছে। যার যেখানে যা খুশি, তাই করছে। জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে, কেটে ফেলা হচ্ছে পাহাড়। ফলে পরিবেশে বিপর্যয় ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান এবং ফসলি জমি– কোনোটাই পাওয়া যাবে না। সেজন্য বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান এবং ফসলি জমি রক্ষা– দুটিই করতে হবে। রাষ্ট্র ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে ন্যূনতম মূল্যে তার পরিবারের জন্য ন্যূনতম বাসস্থান দেবে। যাদের বাসস্থান একসাথে বা কিস্তিতে কেনার সামর্থ্য নেই, রাষ্ট্র তাকে ন্যূনতম বাসস্থান দেবে। এই ন্যূনতম ব্যবস্থার বাইরে নাগরিকেরা নিজস্ব অর্থে বড় আকারের বা নির্ধারিত উন্নত স্থানে বাসস্থান কিনতে পারবে। দেশের সব জমি বাসস্থান, ফসলি জমি, খাল-বিল-জলাশয়, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির, ঈদগা, পার্ক বা খেলার জায়গা ইত্যাদিতে চিহ্নিত থাকবে। বর্তমানের ছনের-টিনের-সেমিপাকা-পাকা ঘরবাড়ির বদলে সমবায়ভিত্তিক উঁচু দালান নির্মাণ করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব বাসস্থানের জন্য পানি-পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, বিনোদন, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। ফসলি জমির সর্বোচ্চ সিলিং হওয়া উচিত ৫ একর বা ৫০০ শতাংশ। ফসলি জমি শুধু কৃষকের কাছেই থাকা উচিত। বাসস্থানের জন্য রাজধানী শহরে ব্যক্তিগতভাবে ৩০ শতাংশের বেশি, জেলা শহরে ৫০ শতাংশের বেশি, উপজেলা বা থানা সদরে ১০০ শতাংশের বেশি

(বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়)

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা

(৪৩ পৃষ্ঠার পর)

জমির মালিক থাকা উচিত নয়। সব খাস জমি শুধু ভূমিহীনদেরকে দেয়া হবে। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত জমি বাজার দরে কিনে ভূমিহীনদের দেবে। ভূমিহীনেরা এ জমি ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু কোনোভাবেই বিক্রি করে স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারবে না। স্বত্ব হস্তান্তর করতে হলে তাকে জমির মূল্য রাষ্ট্রকে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় সরকারের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই ভূমিটি সরকার আবার কোনো ভূমিহীনকে বরাদ্দ দিতে পারবে। ভূমি সংক্রান্ত এসব বিষয় একটি ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকতে হবে।

ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা জিআইএস প্রযুক্তিনির্ভর ডাটাবেজভিত্তিক হতে হবে। জমির নকশা থেকে শুরু করে দেশের প্রতিইঞ্চি ভূমির ডিজিটাল নকশা থাকতে হবে। জমির বেচাকেনা, উত্তরাধিকার, বণ্টন, দান ইত্যাদি এবং সব ধরনের হস্তান্তরের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণভাবে কমপিউটারে করতে হবে। জমি সংক্রান্ত সব তথ্য কমপিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে মাত্র পাচ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব (ডিএলআর কর্তৃক আয়োজিত ২৮ জুন ২০০৮ তারিখের সভায় দেয়া তথ্য)। এতে আর যাই হোক, টিআইবির রিপোর্টে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিবাজ খাত হিসেবে এ খাতটিকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

ক. বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে ফসলি জমি ও পরিবেশ। বর্তমানের নিয়ন্ত্রণহীন অপরিকল্পিতভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান এবং ফসলি জমি রক্ষা– দুটিই করতে হবে। রাষ্ট্র ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে ন্যূনতম মূল্যে তার নিজের ও পরিবারের জন্য ন্যূনতম বাসস্থান দেবে। যার বাসস্থান একসাথে বা কিস্তিতে কেনার সামর্থ্য নেই রাষ্ট্র তাকে ন্যূনতম বাসস্থান বিনামূল্যে দেবে। এ ন্যূনতম ব্যবস্থার বাইরে নাগরিকেরা নিজস্ব অর্থে বড় আকারের বা নির্ধারিত উন্নত স্থানে বাসস্থান কিনতে পারবেন।

খ. দেশের সব জমি বাসস্থান, ফসলি জমি, খাল-বিল-নদী-জলাশয়, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির, ঈদগা, বনাঞ্চল, প্রত্নতত্ত্ব এলাকা, অভয়ারণ্য, মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, পার্ক বা খেলার জায়গা ইত্যাদিতে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত থাকবে। এসব নির্দিষ্ট স্থানের জমি শুধু নির্দিষ্ট কাজেই ব্যবহার করা যাবে।

গ. বর্তমানের ছনের-টিনের-সেমিপাকা-পাকা ঘরবাড়ির বদলে কমিউনিটিভিত্তিক বহুতল উঁচু দালান নির্মাণ করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এসব বাসস্থানের জন্য পানি-পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, বিনোদন, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। পরিবারপ্রতি ফসলি জমির সর্বোচ্চ সিলিং হবে ৫ একর বা ৫০০ শতাংশ। বাসস্থানের জন্য রাজধানী শহরে ব্যক্তিগতভাবে ৩০ শতাংশের বেশি, জেলা শহরে ৫০ শতাংশের বেশি, উপজেলা বা থানা সদরে ১০০ শতাংশের বেশি জমির মালিক থাকা যাবে না। সব খাস জমি শুধু ভূমিহীনদেরকে দেয়া হবে। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত জমি বাজার দরে কিনে ভূমিহীনদের দেবে। ভূমিহীনেরা এ জমি ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু কোনোভাবেই বিক্রি করে স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারবে না। তেমন অবস্থায় সরকারের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই ভূমিটি সরকার পুনরায় কোনো ভূমিহীনকে বরাদ্দ দেবে।

ঘ. ভূমি ব্যবস্থা জিআইএস প্রযুক্তিনির্ভর ডাটাবেজভিত্তিক হবে। জমির রেজিস্ট্রি ও নকশা থেকে শুরু করে দেশের প্রতিইঞ্চি ভূমির ডিজিটাল নকশা থাকবে। জমির বেচাকেনা, উত্তরাধিকার, বণ্টন, দান ইত্যাদি এবং সব ধরনের হস্তান্তরের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণভাবে কমপিউটারে করা হবে। জমি সংক্রান্ত সব তথ্য কমপিউটারে সংরক্ষণ করা হবে এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

২০০০ সালে এডিবি হিসাব করেছিল ভূমি ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার জন্য ২৬ বছর সময় লাগবে এবং এর জন্য ৫০০ কোটি ডলার লাগবে। কিন্তু এখন সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন মাত্র তিন বছরেই ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব।

মনে হয়, আওয়ামী লীগকে যদি ২০১৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হতে হয়, তবে তাকে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। কামনা করব, আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টিকে